হিন্দু আইন সংস্কারে ধর্ম ও মানবতার দাবি

পুলক ঘটক

শুক্লা অদিতি যাকে ভালোবেসে করে বিয়ে করেছে, সে মানুষ ভালো হলেও অর্থসম্পদে সফল হতে পারে নি। স্বামী এবং দুই সন্তান নিয়ে এক ধরনের কঠোর জীবন সংগ্রামে টিকে আছে শুক্লা। কিন্তু তার ভাই হারাধন সাহার জমিজমা, টাকা-পয়সার অভাব নেই। চিত্রটি হলো, শুক্লা গরিব এবং ব্যক্তিগতভাবে কপর্দকহীন; অথচ তার আপন ভাই পিতার সকল সম্পত্তির একচেটিয়া দখল পেয়ে ধনাঢ্য। তবু শুক্লা ভালো আছে। কিন্তু তার আরেক বোন কাকলী তার দুই সন্তান নিয়ে এখন আশ্রিত। ভাই হারাধনের বাড়িতে রাঁধুনি হয়ে আছেন তিনি। স্বামী অকালে মারা যাওয়ার পর স্বামীর বাড়ি পেছনে ফেলে ভাইয়ের বাড়িতে আশ্রয় খুঁজতে বাধ্য হয়েছে কাকলী। এই হারাধন, শুক্লা এবং কাকলী একই পিতার সন্তান। কিন্তু পিতার সম্পত্তিতে ছেলের একছত্র অধিকার, মেয়ের অধিকার নেই। সন্তান হিসেবে পিতার কাছে জন্মগতভাবে যে অধিকার পাওয়ার কথা, হিন্দু ও বৌদ্ধ নারীরা তা থেকে বঞ্চিত।

স্টেপস টুওয়ার্ডস ডেভেলপমেন্ট এবং ওয়ার্ল্ড ভিশন ২০১৪ সালের জুলাইয়ে প্রকাশিত এক গবেষণা প্রতিবেদনে বলেছে, ৭০ শতাংশ নারীর সম্পদের মালিকানা নেই। এক শতাংশের সম্পদ থাকলেও পরে তারা তা হারিয়েছে। ২৯ ভাগ নারী সম্পদের মালিক হয়েছে উত্তরাধিকার সূত্রে। এই ২৯ ভাগ নারীর সবাই আসলে মুসলিম পারিবারিক আইনের আওতাধীন। হিন্দু আইনের আওতাধীন নারীরা সম্পত্তির ক্ষেত্রে এক অর্থে শূন্য অধিকার নিয়ে বেঁচে আছে। কিছু কর্মজীবী নারী বাদ দিলে সকল হিন্দু নারী আশ্রিত– পিতার, স্বামীর, ভাইয়ের অথবা সন্তানের আশ্রিত। উচ্চশিক্ষিত ও প্রতিষ্ঠিত পরিবারের মেয়েরা অনেকেই কিছুটা স্বাবলম্বী হতে পারলেও গরিব, অল্পশিক্ষিত ও কর্মহীন হিন্দু নারীদের দুরবস্থা মানবেতর পর্যায়ে রয়েছে।

আইনগতভাবেই তাদের এরকম অবস্থায় রাখা হয়েছে। শুধু নারী নয়, শিশু, প্রতিবন্ধী এবং প্রচলিত ভাষায় 'হিজড়া' নামে পরিচিত 'লিঙ্গ বৈচিত্র্যময় জনগোষ্ঠী'ও এসব আইনে সুদীর্ঘকাল যাবৎ নানাভাবে বৈষম্য ও বঞ্চনার শিকার হয়ে আসছে। এসব আইন একাধারে বাংলাদেশের সংবিধানের সঙ্গে, আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সনদের সঙ্গে এবং সিডও সনদসহ নারীর প্রতি বৈষম্য নিরসনে স্বাক্ষরিত আন্তর্জাতিক সকল সনদ ও প্রটোকলের সঙ্গে সাংঘর্ষিক।

বাংলাদেশের সংবিধান নাগরিকদের মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা দিয়েছে এবং বলেছে, রাষ্ট্র এমন কোনো আইন প্রণয়ন করবে না যা মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী। এ ধরনের কোনো আইন থাকলেও তা বাতিল হয়ে যাবে। এখানে ঘোষিত মৌলিক অধিকারের প্রথমটিই হচ্ছে, "সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী।" দ্বিতীয়ত বলা

হয়েছে, "কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করিবেন না।" তৃতীয়ত, "রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারী পুরুষের সমান অধিকার লাভ করিবেন।"

সংবিধানের আলোকে দেশের সকল মানুষকে সমঅধিকার দিয়ে অভিন্ন পারিবারিক আইন দরকার। অথচ একেক জনগোষ্ঠীর জন্য একেক ধরনের আইন করে বহুমাত্রিক বৈষম্য জিইয়ে রাখা হয়েছে। বৈষম্যমূলক আইনগুলো চলছে ধর্ম ও প্রথার নামে।

ধর্ম, সম্প্রদায় ও প্রথাগত আইন

ব্রিটিশ আমলে সনাতন ধর্মাবলম্বী হিন্দুদের জন্য প্রবর্তন করা হয় হিন্দু আইন। বৌদ্ধ, জৈন এবং বিভিন্ন আদিবাসী গোত্রের মানুষ আলাদা ধর্মের অনুসারী হলেও তাদের সবাইকে হিন্দু আইনের আওতাভুক্ত করা হয়েছে। ধর্মের নামে প্রচলিত হলেও এই আইনের সঙ্গে ধর্মের সম্পর্ক নামেমাত্র। এসব আইন মূলত প্রথাগত এবং বহুক্ষেত্রে ধর্মের সঙ্গেও সাংঘর্ষিক। ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের প্রথা অনুযায়ী একেক অঞ্চলে একেকরকম হিন্দু আইন ব্রিটিশরা চালু করেছিল। বাংলাদেশেও একেক অঞ্চলে একেকরকম প্রথাভিত্তিক হিন্দু আইন প্রচলিত আছে। বলা বাহুল্য, এই আইন সনাতন ধর্মের অনুসারীদের জন্য সুনির্দিষ্ট ও সর্বজনগ্রাহ্য ধর্মীয় বিধান হলে বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্নরকম আইন হতে পারত না।

ব্রিটিশ সরকার তাদের ২০০ বছরের শাসনামলে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের প্রথাগুলোকে আইন হিসেবে গ্রহণ করেছিল। ব্রিটিশ আমলেই এসব আইন বহুবার সংশোধন, সংযোজন, বর্জন ও পরিমার্জন হয়েছিল। ব্রিটিশ বিদায় নেওয়ার পর স্বাধীন ভারতে এই আইন অনেকবার সংশোধিত হয়েছে। হিন্দুপ্রধান নেপাল এবং মরিশাসেও হিন্দু আইন সংশোধন হয়েছে। সেসব দেশে বৈষম্য তুলে দিয়ে নারী-পুরুষ সমঅধিকারভিত্তিক সুষম আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। ফলে সেসব দেশের উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়েছে। তাতে কারও ধর্মের ক্ষতি হয় নি, বরং উপকার হয়েছে।

ভারতে প্রথাভিত্তিক আইন সংশোধন করে লিঙ্গবৈষম্য দূর করা হলেও বাংলাদেশে তা এখনো করা হয় নি। পাকিস্তানের অন্তর্গত থাকাকালীন বা পরে ১৯৭১ সালে স্বাধীনতার পরেও এই ভূখণ্ডে কোনো সরকারই হিন্দু আইন সংশোধনের কাজে হাত দেয় নি।

পাঁচ আইনে প্রবল বৈষম্য

পারিবারিক পরিসরে অধিকারমূলক ও আইনগত বিষয়সমূহের সঙ্গে বিয়ে বা নরনারীর যুগল জীবনের চুক্তি বা চুক্তিহীন অবস্থান নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত। বিয়ের মধ্য দিয়ে পারস্পরিক অধিকারের প্রসঙ্গ আসে, আত্মীয়-অনাত্মীয়তার প্রভেদ ও অধিকার নির্ধারিত হয়। এর মাধ্যমে পৃথিবীতে নতুন মানবশিশুর আগমন ঘটে এবং সেই শিশুর অধিকারের বিষয়ও প্রাসঙ্গিক হয়। এই পারিবারিক কাঠামোয় বহু জটিল আইনগত বিষয়ের মধ্যে গুরুত্ব বিচারে পাঁচটি ক্ষেত্রে আইনের

সংশোধনকে অগ্রাধিকার দেওয়া দরকার। এই আলোচনায় আমরা ক্রমে সর্বোচ্চ গুরুত্বপূর্ণ উত্তরাধিকার আইনের প্রসঙ্গে যাব।

১. হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন আইন

দাম্পত্য সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রেম ও পারস্পরিক আস্থার সঙ্গে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি এবং উভয় পক্ষের সুরক্ষা প্রাসঙ্গিক বিষয়। নর-নারীর মনস্তাত্ত্বিক ও দৈহিক সম্পর্ক এবং সন্তান জন্ম দেওয়া সব সময় সমাজ বা রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভর করে না। ভুল সম্পর্ক হোক আর সঠিক সম্পর্ক হোক– এক্ষেত্রে প্রকৃতির নিয়মে পরবর্তী দায়টা চাপে নারীর ওপর। কারণ নারীরা সন্তান পেটে ধারণ করেন ও জন্ম দেন। তাই সম্পর্কের ক্ষেত্রে সুরক্ষা ব্যবস্থা নারীর জন্য বেশি প্রয়োজন। তবে নারী-পুরুষ উভয়ের নিরাপত্তার জন্যই আইনগতভাবে বিবাহ নিবন্ধন একটি জরুরি বিষয়।

শুধু বিবাহ নিবন্ধন নয়, উন্নত বিশ্বে নর-নারীর প্রাক-বিবাহ চুক্তিসহ (prenuptial agreement) একত্রে বসবাসের বিভিন্ন ধরনের চুক্তি করার অধিকার আইনের দ্বারা স্বীকৃত আছে। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার আগে ১৯৬১ সালে পাকিস্তানের তৎকালীন সামরিক শাসক আইউব খান যুগান্তকারী 'মুসলিম পারিবারিক আইন' প্রণয়ন করেন, যা আজও বহাল আছে। এরপর ১৯৭৪ সালের মুসলিম বিবাহ ও তালাক (রেজিস্ট্রেশন) আইন (সংশোধিত ৮ মার্চ, ২০০৫) মুসলমানদের বিবাহ ও পরিবার ব্যবস্থাকে কাঙ্ক্ষিত শৃঙ্খলায় নিয়ে এসেছে। কিন্তু হিন্দু, বৌদ্ধসহ বিভিন্ন আদিবাসী জনগোষ্ঠীর বিয়ের বিষয়টি সম্পূর্ণ ধর্মীয় বিশ্বাস ও প্রথানির্ভর হয়ে আছে যুগের পর যুগ।

হিন্দু বিয়ের অনুষ্ঠানগুলো শাস্ত্রবিধি এবং প্রথার সংমিশ্রণ। শাস্ত্রে বৈশিষ্ট্য ও অধিকার ভেদে এগারো প্রকার বিয়ের বিধান আছে। বিবাহ নিবন্ধনে কোনো ধর্মীয় বাধা নেই। বরং প্রথাগতভাবে এটি আগে থেকে স্বীকৃত। কারণ বাঙালি হিন্দু বিয়েতে স্মরণাতীতকাল থেকে পাটিপত্র করা প্রচলিত আছে। পাটিপত্রই বাঙালি হিন্দু বিয়ের প্রথম আচার। নিবন্ধনের মাধ্যমে এই পাটিপত্রকে রাষ্ট্রীয়ভাবে স্বীকৃতি দিলে কার ক্ষতি? অথচ এ বিষয়েও আইন প্রণয়নে একটি প্রতিক্রিয়াশীল মহল শুরু থেকে বাধা দিয়ে এসেছে। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর বাংলাদেশ সরকার ২০১২ সালে হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন আইন প্রণয়ন করে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলো, এই আইনেও বিবাহ নিবন্ধনকে ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে রেখে দেওয়া হয়েছে।

মুসলিম বিবাহ ও তালাক (রেজিস্ট্রেশন) আইন অনুযায়ী নিবন্ধন করা বাধ্যতামূলক। যদি কেউ বিবাহ রেজিস্ট্রি না করেন, তাহলে তিনি এ আইনের অধীনে অপরাধ করেছেন বলে বিবেচিত হবেন। এ অপরাধের জন্য আইন কর্তৃক নির্ধারিত শাস্তি হচ্ছে দুই বছর বিনাশ্রম কারাদণ্ড অথবা আর্থিক জরিমানা, যা তিন হাজার টাকা পর্যন্ত হতে পারে, অথবা উভয় ধরনের শাস্তিই হতে পারে। আইনের আওতায় বিবাহ নিবন্ধন বাধ্যতামূলক না করে শুধু ধর্মীয় বিশ্বাস বা প্রথার ওপর নির্ভর করে বসে থাকলে মুসলমানদের জন্যেও আইনগত সুরক্ষা সুদূরপরাহত হতো।

হিন্দু, বৌদ্ধ ও বিভিন্ন আদিবাসী জনগোষ্ঠীর নরনারীর পারস্পরিক পরিচিতি, স্বীকৃতি, অধিকার এবং তাদের সন্তানদের ভবিষ্যৎ অধিকার নির্ধারণে জটিলতা নিরসনের জন্য বিবাহ নিবন্ধন বাধ্যতামূলক করা আজ সময়ের দাবি। কেউ যেন বিয়ের নামে ফাঁকিবাজি, প্রতারণা এবং বিয়ের মাধ্যমে জন্ম নেওয়া শিশু বা অনাগত কোনো শিশুর ভবিষ্যৎকে বিপন্ন করতে না পারে তা রাষ্ট্রকে নিশ্চিত করতে হবে।

২. বিবাহবিচ্ছেদ আইন :

এ প্রসঙ্গে সাম্প্রতিক সময়ে বহুলালোচিত একটি ঘটনাকে দৃষ্টান্ত হিসেবে নিই। গত ২০ এপ্রিল পঞ্চগড়ে রোহিণী বর্মণ নামক একজন তরুণ দুইজন মেয়ে– ইতি রানী এবং মমতা রানীকে এক আসরে বিয়ে করেছিলেন। মিডিয়া ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বহুলালোচিত এই বিয়েটি আইনগতভাবে সঠিক ছিল। কারণ বাংলাদেশের হিন্দু আইনে পুরুষদের একসঙ্গে অনেকগুলো বিয়ে করতে কোনো বাধা নেই। বিষয়টি মিডিয়ায় ত্রিভুজ প্রেমের সফল পরিণতি হিসেবে উপস্থাপিত হওয়ায় পুরুষতান্ত্রিক বা লিঙ্গ নিপীড়নমূলক মূল্যবোধে আচ্ছন্ন এই জনসমাজের বহু মানুষ তাদের ফেসবুক প্রতিক্রিয়ায় এই বিয়েকে স্বাগত জানিয়েছিল। যদিও সভ্যতা ও মানবতার দৃষ্টিতে এটি ছিল নোংরা ও নিষ্ঠুর কাজ।

মিডিয়ার পরবর্তী খবর অনুযায়ী বিয়ের একমাস যেতে না যেতেই সেই দুই মেয়ের একজন মমতা রানী গত ১২ মে তার স্বামীকে এফিডেভিটের মাধ্যমে 'ডিভোর্স' দেন, যা আইনগত নয়। আইনসম্মত ও সামাজিকভাবে স্বীকৃত এই নোংরা কাজটি দৃশ্যত বেআইনি পন্থায় অবসান হয়েছে। কিন্তু অবসান কি আদৌ হয়েছে? আইনত হিন্দু বিয়ের কোনো অবসান নেই। প্রেম খেলার শিকার মেয়ে দুটির জীবনের তিক্ততা ও কষ্ট শেষপর্যন্ত তাদের কোথায় নিয়ে যাবে তা অনিশ্চিত। এ ধরনের বেআইনি বিচ্ছেদের মাধ্যমে মেয়েটির ক্ষতিপূরণ পাওয়ারও সুযোগ নেই। অথচ মেয়েটির সামাজিক অবস্থান, ব্যক্তিগত জীবন, আবেগ অনুভূতি এবং ভবিষ্যৎ সবকিছু ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সন্দেহ নেই।

বাংলাদেশে বিদ্যমান হিন্দু আইনে বিবাহবিচ্ছেদের কোনো সুযোগ নেই। একজন মেয়ে যদি একবার কোনো পুরুষকে বিয়ে করে– সেই পুরুষ যদি দুর্বৃত্ত, লুচ্চা, অত্যাচারী হয় এবং এমনকি চোর-ডাকাত বা দস্যুও হয়, তার সঙ্গে মতের অমিল হে

লও তাকে সারাজীবন ওই পুরুষের সেবা করে যেতে হবে। এমনকি বিয়ের পর যদি প্রমাণিত হয় ওই পুরুষটি সম্পূর্ণরূপে যৌনসামর্থ্যহীন, পুরুষটি যদি মাদকাসক্ত কিংবা পাগল হয়, সে যদি বাসায় না থেকে ফুটপাতে পড়ে থাকে, তবু ওই পুরুষকেই ধ্যানজ্ঞান করে বাকি জীবন কাটাতে হবে তাকে। কারণ এই বিবাহ অবিভাজ্য, অর্থাৎ বিভক্ত হওয়া অসম্ভব– এটা ধর্মের বিবাহ। যদিও ধর্মের নির্দেশ এরকম নয়। পরাশর সংহিতায় বলা হয়েছে,

"নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।
পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরণ্যো বিধিয়তে।"

এর অর্থ হলো, স্বামী যদি নিরুদ্দেশ হয়, মারা যায়, প্রব্রজ্যা অবলম্বন করে (অর্থাৎ সন্ন্যাসী হয়ে যায়), ক্লীব (পুরুষত্বহীন) হয় অথবা পতিত (ধর্ম বা সমাজ থেকে বিচ্যুত) হয়– এই পাঁচ প্রকার বিপদ উপস্থিত হয়, তবে নারীর জন্য অন্য পাত্রের সঙ্গে বিয়ে দেওয়া বিধেয়। গরুড় পুরাণের প্রথম খণ্ডের ১০৭ নম্বর অধ্যায়ের ২৮ নম্বর শ্লোকেও হুবহু একই কথা বলা হয়েছে। এরকম বিধান বৈদিক অন্যান্য শাস্ত্রগ্রন্থেও আছে। তা ছাড়াও শাস্ত্রগতভাবে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের কমপক্ষে ১১ প্রকার বিয়ের কথা আছে। বৌদ্ধ ও জৈনশাস্ত্রের বিধান আলাদা, যারা সবাই হিন্দু আইনের আওতায় আছে।

ইংরেজরা হিন্দু আইন বানানোর সময় এসব ধর্মীয় বিধান লঙ্ঘন করা হয়েছে। ধর্মের বিধানকে উপেক্ষা করে রঙ্গশালায় নটী ও ঘরে রক্ষিতার প্রতিপালক সামন্তপ্রভুদের এবং তাদের সহযোগী পণ্ডিতশ্রেণির সমর্থনে অবিভাজ্য বিয়ের বিধান যুক্ত করা হয়েছে। সে আইন হয়েছে একেক জায়গায় একেক রকম, তৎকালীন ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের সামন্তবাদী সমাজে প্রচলিত প্রথার ভিত্তিতে।

ওয়ারেন হেস্টিংসের আমলে ১৭৭২ সালে ইংরেজরা হিন্দু আইন প্রবর্তন শুরু করলেও সেখানে বিচ্ছেদের কোনো আইনই ছিল না। তবে ইংরেজরা ভারত থেকে বিদায় নেওয়ার অল্প কিছুদিন আগে ১৯৪৬ সালে "The Hindu Married Women's Right to Separate Residence and Maintenance Act, 1946" শিরোনামে একটি আইন প্রণয়ন করে। সেই আইনটি বাংলাদেশে এখনো চলছে। ভারতে নতুন আইন হয়েছে এবং বিবাহবিচ্ছেদের অধিকার দেওয়া হয়েছে।

১৯৪৬-এর সেই আইন অনুযায়ী কোনো হিন্দু স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সম্পর্ক খুব খারাপ হলে এবং তাদের একসঙ্গে বসবাস করা অসম্ভব বলে আদালতের সামনে প্রতীয়মান হলে নারীকে আলাদা বসবাসের সুযোগ দেওয়া হয়। সেক্ষেত্রে আলাদা বাস করলেও স্ত্রীকে খোরপোষ দিতে স্বামী বাধ্য। মাসে মাসে কত দিতে হবে আদালত সেটা নির্ধারণ করে দেয়।

কিন্তু প্রশ্ন হলো, এভাবে সেপারেশন হলেও তাদের কি স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক বজায় থাকবে? নাকি আদালতের আদেশের পর স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কের অবসান হবে? না, তাতে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক শেষ হয়ে যায় না। বিবাহবিচ্ছেদ হয় না, অর্থাৎ বিবাহ অটুট থাকে। শুধুই নারীর একাকী বসবাসের বিধান! ওই স্বামীর স্ত্রী হিসেবে পরিচয় দিয়েই মেয়েটিকে সারাজীবন বাঁচতে হবে। শুধু তাই নয়, তাকে সতী-সাধ্বী হয়ে সারা জীবন চলতে হবে। সেই পরীক্ষায় ফেল করা চলবে না। কোনো কৌশলে কলঙ্ক আরোপ করা গেলে ভরণপোষণ বন্ধ। এই ভরণপোষণ দেওয়ার দায় থেকে বাঁচার জন্য তার কথিত পতিধন তাকে অসতী প্রমাণ করার জন্য কূটকৌশলের আশ্রয় নেবে না, তার

নিশ্চয়তা কেউ অবশ্য দিতে পারে না। আর এক্ষেত্রে মেয়ের অন্যত্র বিয়ে করার তো প্রশ্নই ওঠে না।

তবে স্বামীকে সৎ বা সাধুপুরুষ হয়ে চলতে হবে, এমন কোনো বিধান নেই। ছেলে ইচ্ছে করলে আরও যতগুলো ইচ্ছে বিয়ে করতে পারে, বাসায় ভাড়াটে নটী, উপপত্নী বা রক্ষিতা রাখতে পারে, চাইলে যৌনপল্লিতে যাতায়াত করতে পারে, কোনো বাধা নেই। সতী হয়ে বাঁচতে হবে কেবল নারীকে।

এখন প্রশ্ন হলো, আইন না থাকা সত্ত্বেও আলোচ্য ঘটনায় ডিভোর্স হলো কীভাবে? আসলে আইনকে পাশ কাটিয়ে বাংলাদেশের হিন্দু পরিবারগুলোতে এ ধরনের গোপন "বিবাহবিচ্ছেদ" অহরহ হচ্ছে। বাস্তবতার নিরিখে ও জীবনের প্রয়োজনে হচ্ছে। সমঝোতার মাধ্যমে বেআইনি পন্থায় একটা রফা হচ্ছে। মানুষের বিবাহবিচ্ছেদ নেওয়ার অধিকার আছে। হিন্দু আইন সেই অধিকারকে অস্বীকার করলেও সমাজে যে 'বিচ্ছেদ আইনে'র চাহিদা আছে, এই ঘটনাগুলোই তার প্রমাণ।

আইনগতভাবে আলোচ্য ঘটনার মেয়েটি কখনোই দ্বিতীয় বিয়ে করতে পারবে না। নতুন করে অন্য কাউকে বিয়ে করলে সেটা বেআইনি হবে। বিয়ে করতে হলে অপরিষ্কার পথেই করতে হবে এবং তাতে ভবিষ্যতে অনাগত সন্তানের উত্তরাধিকারসহ বিভিন্ন প্রশ্নে বহুরকমের জটিলতা তৈরি হবার সম্ভাবনা আছে। গ্রামীণ সমাজে মেয়েটির ভালো কোনো জায়গায় পাত্রস্থ হওয়াও কঠিন। আইনের চোখে এবং সমাজের চোখে সে হবে দ্বিচারিণী। নারী-নিপীড়নমূলক সমাজে কয়জন আছে, যারা মেয়েটির জীবন বাস্তবতাকে সম্মানের সাথে দেখবে? কয়জন দরদ দিয়ে ভাববে এই মেয়েটিও একজন মানুষ, রক্তে-মাংসে গড়া দোষে-গুণে মেশানো একজন মানবসন্তান?

মেয়েটির পরিণতি আরেক দিক থেকে চিন্তা করলে দেখা যায়, তার কোনো আর্থিক সুরক্ষা নেই। কারণ হিন্দু আইন অনুযায়ী নারী হয়ে জন্মানোর কারণে সে বাবার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হতে পারবে না। স্বামীর কাছ থেকেও কিছুই পাবে না।

এ ধরনের ঘটনায় মেয়েরা সবাই প্রতিকারহীন ভিকটিম। বিবাহবিচ্ছেদের প্রশ্নে আইনগত শূন্যতার বাস্তবতায় ভিকটিমরা অনেক সময় উকিলের পরামর্শে আরেক ধরনের অপলাপ ঘটায়। সেটা হলো সরাসরি যেহেতু কোনো প্রতিকার পাওয়ার সুযোগ নেই, সুতরাং ডমেস্টিক ভায়োলেন্সের মামলা অথবা যৌতুকের মামলা দিয়ে ফাঁদে ফেলানো। এ ছাড়া তাদের কাছে কোনো আইনি উপায় নেই। এ সবই আইনহীন অসুস্থ রাষ্ট্র ও অসুস্থ সমাজের লক্ষণ।

বাস্তবতার নিরিখে হিন্দু বিবাহবিচ্ছেদ আইন প্রণয়ন করা এবং স্ত্রী বর্তমান থাকতে বিশেষ যৌক্তিক পরিস্থিতি ব্যতিরেকে পুরুষের বহুবিবাহ নিষিদ্ধ করা অতি জরুরি। অথচ তাতেও প্রতিক্রিয়াশীলদের বাধা লক্ষণীয়। বলা হচ্ছে, বিবাহবিচ্ছেদ আইন হলে হিন্দু আইনের পবিত্রতা

ক্ষুণ্ন হবে এবং অহরহ বিবাহবিচ্ছেদ হবে। আইন থাকলে সকল হিন্দু নারী বিবাহবিচ্ছেদ চাইবে এবং হিন্দুদের সকল সংসার ভেঙে যাবে– এ ধরনের অভিযোগ ভিত্তিহীন। আসলে বিবাহবিচ্ছেদ শুধু সেখানেই হয়, যে সংসারে সুখ নেই, যেখানে জটিলতা আছে ও স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অশান্তি চূড়ান্ত পর্যায়ে। যাদের বিবাহবিচ্ছেদ প্রয়োজন তাদের অধিকার দিতে অন্যদের আপত্তি কেন? অন্যের অধিকারের উপর হস্তক্ষেপকারী এমন আপত্তিকে সরকার বিবেচনায় নেবে কোন যুক্তিতে?

৩. অভিভাবকত্ব আইন

সন্তান মা এবং বাবা উভয়ের আদরের ধন। তাই সন্তানের অভিভাবকত্বের ক্ষেত্রে দুজনের সমান অধিকারের বিষয়টি একটি সরল বিবেচনা। তবে শিশুর প্রয়োজনের নিরিখে মায়ের অধিকারের বিষয়টি বিশেষ বিবেচনার দাবি রাখে। মায়ের অগ্রাধিকার বিবেচনা দূরের কথা, হিন্দু আইনে সন্তানের অভিভাবকত্ব সম্পূর্ণরূপে পিতার অনুকূলে রয়েছে। তা ছাড়া, হিন্দু বিবাহবিচ্ছেদ যেহেতু আইনগতভাবে স্বীকৃত নয়, তাই স্বতন্ত্র বসবাসের ক্ষেত্রে মা শুধু খোরপোষই পাচ্ছে। সন্তানের অধিকারও তার বাবার। বিবাহবিচ্ছেদের যেমন সুযোগ নেই, তেমনি সন্তানের অধিকার নিয়ে আইনের আশ্রয় চাওয়ারও সুযোগ নেই।

স্বামী দ্বিতীয় বিয়ে করেছে এবং সন্তান জন্মের পর থেকেই মা এককভাবে শিশুটিকে তার সবকিছু দিয়ে কষ্টেসৃষ্টে বড়ো করছেন, বাবা খোঁজও রাখছেন না, এমন ঘটনা আছে। অথচ সেই শিশুর অভিভাবকত্ব মায়ের হাতে নেই।

মায়ের কাছে মানুষ হওয়া ঠাকুরগাঁও জেলার এক মেয়ে ২০০৭ সালে এসএসসি পরীক্ষার ফরম পূরণের সময় বাবার নাম উল্লেখ করে নি। এ কারণে রাজশাহী শিক্ষাবোর্ড তাকে পরীক্ষায় প্রবেশপত্র দেয় নি এবং মেয়েটির শিক্ষাজীবন সেখানেই শেষ হয়ে যায়। ওই ঘটনায় বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড অ্যান্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট), মহিলা পরিষদ এবং নারীপক্ষ যৌথভাবে হাইকোর্টে একটি রিট আবেদন করেছিল। আবেদন শুনানির পর ২০০৯ সালের ৩ আগস্ট হাইকোর্ট রুল জারি করে।

এসএসসি অথবা এইচএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য বাবার নাম লেখার বাধ্যবাধকতা কেন অসাংবিধানিক বা অবৈধ ঘোষণা করা হবে না তা জানতে চায় আদালত। সরকারপক্ষ এর জবাব না দেওয়ায় আজ পর্যন্ত সেই রুলের শুনানি হয় নি।

প্রশ্ন হলো, যে বাবা দায়িত্ব নেয় নি সে বাবার পরিচয় বহন করতে বা তাকেই অভিভাবক হিসেবে মানতে ব্যক্তিকে বাধ্য করা হবে কেন? অবিবাহিতা, স্বামী পরিত্যক্তা বা বিধবা কোনো নারী ঘটনাচক্রে মা হয়ে গেলে সেই সন্তানকে অভিভাবকত্ব জটিলতায় ভুগতে হবে কেন? লিঙ্গবৈষম্য নিরসন এবং সন্তানের পরিচয় ও অভিভাবকত্ব নির্ধারণের জটিলতাগুলো দূর করে আধুনিক মানবিক আইন প্রণীত হওয়া উচিত।

৪. দত্তক আইন

বাংলাদেশে মুসলিম পারিবারিক আইনে দত্তক নিষিদ্ধ। হিন্দু আইনে দত্তক নেওয়ার বিধান থাকলেও সে অধিকার শুধু পুরুষের। স্বামীর অনুমতিসাপেক্ষে স্ত্রী দত্তক নিতে পারে। কোনো অপুত্রক বিধবা মৃত্যুর আগে স্বামীর "পূর্বনির্দেশ ছিল" প্রমাণ করতে না পারলে দত্তক নিতে পারে না। শুধু তাই নয়, দত্তক নিতে হবে শুধু পুত্র অর্থাৎ ছেলেশিশুকে। মেয়েশিশু দত্তক নেওয়ার বিধান নেই। বিচিত্র লিঙ্গের কাউকে দত্তক নেওয়ার তো প্রশ্নই ওঠে না। আইনে বর্ণবৈষম্য করারও নির্দেশ আছে। ভিন্ন গোত্র বা বর্ণের শিশুকে দত্তক নেওয়া যাবে না। প্রতিবন্ধী, রুগ্ন, অসহায় শিশুকে দত্তক নেওয়া যাবে না। এ ধরনের বিধান শিশুর প্রতি বৈষম্যমূলক এবং অমানবিক।

বিদ্যমান হিন্দু আইনে কন্যাসন্তান থাকলেও পিতা অন্যের ছেলেকে দত্তক নিতে পারে, কিন্তু পুত্রসন্তান থাকলে দত্তক নেওয়া যায় না। কন্যা থাকা সত্ত্বেও অপুত্রক কোনো ব্যক্তি বা দম্পতি যদি পুত্রসন্তান দত্তক নেয় তাহলে কন্যারা পিতামাতার সম্পত্তির জীবনস্বত্ব হিসেবে প্রাপ্য উত্তরাধিকার থেকেও বঞ্চিত হয়। বিধবা, অবিবাহিত নারী বা অবিবাহিত পুরুষ দত্তক নিতে পারে না। কোনো ছেলেকে সন্তান হিসেবে দত্তক নেওয়ার পর যদি সেই দম্পতির ঘরে পুত্রসন্তান জন্ম নেয়, তবে উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে দত্তক পুত্র পাবে ওই ঔরসজাত পুত্রের অর্ধেক। এই বৈষম্য দূর করা দরকার।

ধর্মের নামে নারীর প্রতি বিশেষভাবে বৈষম্যমূলক এসব আইন বানিয়েছে ইংরেজরা। অথচ মহাভারতে কন্যাসন্তান দত্তক নেওয়ার নজির আছে। পঞ্চপাণ্ডবের মাতা কুন্তি নিজেও রাজা কুন্তীভোজের দত্তক কন্যা ছিলেন। কুমারী অবস্থায় সন্তান জন্ম দেওয়াসহ শাস্ত্রে এসবের স্বীকৃতি আছে। রাজা দ্রুপদের জ্যেষ্ঠ সন্তান শিখণ্ডী বৈচিত্র্যময় লিঙ্গের হলেও তিনি একজন বড়ো মাপের বীর হিসেবে স্বীকৃত ছিলেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে তিনি অংশ নিয়েছেন। অথচ এই মানুষগুলোকে হিন্দু আইনে মানবিক মর্যাদা দেওয়া হয় নি। এই আইন যত শীঘ্র সম্ভব সংশোধন করে উন্নত হিন্দু আইন প্রণয়ন করা দরকার।

৫. উত্তরাধিকার আইন

সমান অধিকার দূরে থাক, প্রচলিত হিন্দু আইন অনুযায়ী পিতামাতার সম্পত্তিতে পুত্রসন্তানের উপস্থিতিতে কন্যাসন্তানের অধিকার নেই। পুত্রসন্তান না থাকলে কন্যাসন্তান প্রয়াত পিতার সম্পত্তি ভোগদখল করতে পারে মাত্র। শুধু পিতার কেন, স্বামীর সম্পত্তিতেও নিরঙ্কুশ উত্তরাধিকার নেই স্ত্রীর। তাদের অধিকার কেবল ভরণপোষণ লাভ অর্থাৎ আশ্রিত হয়ে থাকা, কিংবা বড়োজোর সম্পত্তির ভোগদখল। কেবল নারী নয়, লিঙ্গ বৈচিত্র্যময় জনগোষ্ঠীও উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হয় অন্ধ, বোবা, কালা এবং দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত ব্যক্তিরাও। এরকম বিধান অমানবিক।

নয়টি সুনির্দিষ্ট কারণে হিন্দু আইন, বিশেষত উত্তরাধিকার আইনের সংস্কার আশু প্রয়োজন। কারণগুলো হলো :

১. ন্যায় প্রতিষ্ঠা : কাউকে মানুষ হিসেবে প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করা অন্যায়। বিদ্যমান আইন পুরুষকে একচেটিয়া কর্তৃত্ব দিয়েছে। নারী এবং লিঙ্গ বৈচিত্র্যময় জনগোষ্ঠীকে নানাভাবে অমর্যাদা ও অধিকারবঞ্চিত করেছে। তাই ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য হিন্দু আইন সংশোধন দরকার।

২. উন্নতি : সমঅধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হলে নারীর অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং পারিবারিক ক্ষমতায়ন হবে। সমাজের পিছিয়ে পড়া অর্ধেক অংশের উন্নয়ন হলে মানবসম্পদ ও অর্থসম্পদের বিকাশ ঘটবে। ফলে হিন্দু সম্প্রদায় এবং দেশ উন্নত হবে।

৩. শক্তিবৃদ্ধি : পরিবারে নারীরা পরনির্ভরশীল না থেকে আত্মনির্ভরশীল ও আত্মমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হলে হিন্দু পরিবারগুলো শক্তিশালী হবে। নারীশিক্ষা বাড়বে এবং সংসার ও সম্পদ পরিচালনায় নারীরা আরও দক্ষ হয়ে উঠবে। নারী "অবলা" থাকবে না। নারীশক্তি এগিয়ে আসায় সমাজে বাড়তি শক্তির জোগান হবে, যে শক্তিকে এতকাল যাবৎ দমিত করে রাখা হয়েছে।

৪. মর্যাদাবৃদ্ধি : আইন সংশোধন করে নারী ও ভিন্নলিঙ্গের মানুষকে সমঅধিকার ও সমমর্যাদা দেওয়া হলে বিশ্বসভায় হিন্দু সমাজের মর্যাদা বাড়বে। সভ্য দুনিয়ায় হিন্দুদের অবস্থান হবে প্রথম সারিতে। যেসব সম্প্রদায় বৈষম্যমূলক আইন ও নীতির দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে তাদের জন্য হিন্দুরা অনুকরণীয় আদর্শ হবে।

৫. পরিবর্তন ও গতিশীলতা : সময় ও সমাজ গতিশীল। সময়ের স্রোতে অনেক কিছু বদলে যায় এবং নতুন বাস্তবতা হাজির হয়। তাই সমাজ বদলায়। সমাজকে বিশেষ কোনো সময়ের আইনের ফাঁদে বেঁধে রাখা সম্ভব নয়। "যে নদী হারায়ে স্রোত চলিতে না পারে, সহস্র শৈবাল দাম বাঁধে আসি তারে। যে জাতি জীবনহারা অচল অসাড়, পদে পদে বাঁধে তারে জীর্ণ লোকাচার।" আপনি শিশুর গায়ে একটি চিরস্থায়ী জামা পরিয়ে দিয়েছেন। শিশুটি বেড়ে উঠছে কিন্তু তার জামাটি বাড়ছে না– এরকম জামা তার গায়ে কতদিন থাকবে? চিরস্থায়ীভাবে অপরিবর্তনশীল আইনের জামা পরিয়ে কোনো রাষ্ট্র ও সমাজের গতি-প্রবৃদ্ধি আটকে রাখা যায় না। তাই সমাজ ও সময়ের গতির বাস্তবতা মেনে নিয়ে হিন্দু আইন সংস্কার ও আধুনিকায়ন করা অনিবার্য।

৬. মামলা জটিলতা : সংবিধিবদ্ধ (Codified) না হওয়ায় প্রাচীন আইনসমূহে অস্পষ্টতা, দ্ব্যর্থকতা, স্ববিরোধ ও অসংগতি আছে। বিভিন্ন আদালতের বিভিন্নরকম রায় এবং আধুনিক রাষ্ট্রীয় আইন ও বিধিবিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিকতার কারণেও আদালতে মামলা পরিচালনায় অসুবিধা ঘটে। তাই হিন্দু আইনের সংশোধন, সুস্পষ্টকরণ, আধুনিকায়ন ও সংবিধিবদ্ধকরণ জরুরি।

৭. বিভিন্ন দেশে আইন সংশোধন : হিন্দু আইন নামে বাংলাদেশে যা প্রচলিত আছে তা কোনো ধর্মীয় আইন নয়। এগুলো ইংরেজদের বানানো পরিত্যক্ত প্রথাভিত্তিক আইন। বাংলাদেশের বিভিন্ন

অঞ্চলে বিভিন্নরকম প্রথাভিত্তিক হিন্দু আইন চালু আছে। ভারতেও বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্নরকম প্রথাভিত্তিক হিন্দু আইন চালু ছিল। ভারত, নেপাল এবং মরিশাসে হিন্দু আইন সংশোধন করে সবার সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। হিন্দু আইন ধর্মের কোনো আবশ্যিক শর্ত হলে হিন্দুপ্রধান ওই দেশগুলো আইন সংশোধন করত না। ইউরোপ-আমেরিকার বিভিন্ন দেশে বসবাসরত হিন্দুরা সেসব দেশের আইনের আওতায় পরিচালিত হন। তাতে ধর্ম পালনে কোনো সমস্যা হয় না।

৮. **ধর্মের মূল চেতনা প্রতিষ্ঠা :** বিদ্যমান হিন্দু আইন সনাতন ধর্মের এবং বৌদ্ধ ধর্মের মূল চেতনা থেকে বিচ্যুত ও বিকৃত। নারীকে শক্তিহীন, অধিকারহীন, দুর্বল ও আশ্রিত করে রাখা এবং লিঙ্গ বিবেচনায় মানুষের প্রতি বৈষম্য করা সনাতন এবং বৌদ্ধ উভয় ধর্মমতের বিরোধী। সনাতন ধর্মে নারীকে জগন্মাতার অধিষ্ঠান ও শক্তির আধার হিসেবে দেখা হয়। নারীরা দেবী দুর্গার বহুরূপের প্রকাশ; সৃষ্টি, স্থিতি এবং বিনাশের শক্তি (সৃষ্টিস্থিতিবিনাশানাং শক্তিভূতে সনাতনি)। ঈশ্বর সর্বভূতে শক্তিরূপে এবং মাতৃরূপে বিরাজিতা (যা দেবী সর্বভূতেষু শক্তি রূপেন সংস্থিতা)। শক্তিময়ী নারীকে শক্তিহীন ও দুর্বল ভাবা, জগতের বাণীমূর্তি নারীকে "অবলা" বিবেচনা করা এবং আইনগতভাবে পুরুষের আশ্রিত করে রাখা ধর্মের পরিপন্থী। মানুষ ও ধর্মের জাগরণের জন্য মাতৃশক্তির প্রকৃত বোধন দরকার।

৯. **হিন্দু সম্প্রদায়কে রক্ষা :** নারীর প্রতি বৈষম্য ও বঞ্চনার কারণে বর্তমানে বাংলাদেশে কখনো কখনো হিন্দু নারীরা অন্য ধর্মের মানুষদের দ্বারা প্রলুব্ধ হয়ে ধর্মান্তরিত হন। অর্থহীন, বিত্তহীন, অধিকারহীন, আত্মবিশ্বাসহীন, পরনির্ভরশীল এবং মেধায়-মননে ও আইনগতভাবে দুর্বল করে রাখায় অনেকে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেন। তাদের কেউ কেউ ভিন্নধর্মের মানুষের পাল্লায় পড়ে বিভ্রান্ত হন।

নারীদের সমঅধিকার দিলে তাদের ক্ষমতায়ন ঘটবে। আত্মশক্তিতে বলীয়ান একজন মানুষকে সহজে বিভ্রান্ত করা যায় না। ফলে ভুলিয়ে বা বলপূর্বক তুলে নিয়ে গিয়ে বিয়ে বা ধর্মান্তরিত করা কঠিন হবে। তা ছাড়া, উত্তরাধিকারে নারীরা সমঅংশীদার হলে তাদের মধ্যে সম্পদ হারানোর ভয়ও যুক্ত হবে। কারণ আইন অনুযায়ী কেউ ধর্মান্তরিত হলে উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। এতে বাংলাদেশের ক্ষয়িষ্ণু হিন্দু সম্প্রদায় সুরক্ষিত হবে।

ধর্মান্তরিতের উত্তরাধিকার

উত্তরাধিকার আইন সংশোধনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সংখ্যালঘু হিন্দু ও বৌদ্ধ জনগোষ্ঠীর একটি বড়ো ভীতি হলো ধর্মান্তরিত হওয়া। এই বিষয়টির প্রতি সরকার এবং সুবিবেচক জনসমাজের বিশেষভাবে মনোযোগী হওয়া প্রয়োজন। ধর্ম, সম্প্রদায় ও প্রথার ভিত্তিতে বাংলাদেশে আলাদা আলাদা পারিবারিক আইন থাকায় কোনো ব্যক্তি ধর্মান্তরিত হলে সেই ব্যক্তি কোন পারিবারিক আইনের আওতায় পড়বে, তা নির্ধারণ করা জটিল। তবে বাস্তবতা হলো, কেউ ইসলাম ধর্ম থেকে খ্রিষ্টান, হিন্দু বা অন্য কোনো ধর্মে ধর্মান্তরিত হলে পৈত্রিক সম্পত্তিতে অধিকার পাওয়া তার জন্য

কঠিন। কিন্তু হিন্দু বা বৌদ্ধ থেকে মুসলমান হয়ে গেলে তার গায়ের জোর আরও বাড়ে। দেশে গায়ের জোরের অনেকরকম প্রয়োগ আছে। বিশেষ করে যখন দখলস্বত্ব একটি স্বীকৃত বিষয়। দখল যার, সম্পত্তির ওপর অধিকার তার। আদালতে মামলা মোকদ্দমা করে দখল উচ্ছেদ করা? সেটা দুর্বল এবং গরিবের জন্য নয়। শত বছরেও অপেক্ষার শেষ হয় না। বরং মামলা করে আরও নিঃশেষ হওয়ার সুযোগ থাকে। এই বাস্তবতায় আক্রান্ত ও বিপন্ন সংখ্যালঘুদের জন্য বিশেষ সুরক্ষার প্রয়োজন আছে। সম্পত্তির কারণে সংখ্যালঘু নারীদের যেন বাড়তি নিরাপত্তা সংকট তৈরি না হয় তা নিশ্চিত করতে হবে।

বিদ্যমান আইন অনুযায়ী কেউ ধর্মান্তরিত হলে পৈত্রিক সম্পত্তিতে আর অধিকার থাকে না। ইংরেজরা Caste Disabilities Removal Act, ১৮৫০ নামে একটি আইন করেছিল, যাতে ধর্মান্তরিত হলেও সম্পত্তির অধিকার বজায় থাকে। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ওই আইনটি রদ করা হয়েছে। ফলে সাধারণভাবে এখন ধর্মান্তরিত হলে কেউ সম্পত্তি পায় না। সংখ্যালঘু সুরক্ষার স্বার্থে সংসদে প্রণীত একটি আইনের দ্বারা এই বিষয়টি আরও সুস্পষ্ট করা দরকার।

উপসংহার

হিন্দু সমাজকে শক্তিশালী করতে হলে হিন্দু নারীর ক্ষমতায়ন দরকার। নারীদের ক্ষমতায়নের জন্য পুরাতন আইনগুলো সংশোধন হওয়া উচিত। সব আইনের সংশোধন দরকার। হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সকল পারিবারিক আইন একদম ঢেলে সাজানো দরকার। অভিন্ন সিভিল কোড হওয়া দরকার। আধুনিক উন্নতবিশ্বের আদলে নারীদের পূর্ণাঙ্গ অধিকার ও ক্ষমতা দিয়ে আইনগুলো যুগোপযোগী করা দরকার। তাতে দেশ এগোবে। কিন্তু মুসলিম মোল্লাতন্ত্র যদি তাতে রাজি না-ও হয়, তারা যদি দেড় হাজার বছর পেছনে পড়ে থাকাকেই ভালো মনে করে, তবু হিন্দুরা কেন নিজ সম্প্রদায়কে এগিয়ে নেবে না? তা ছাড়া মুসলমান সম্প্রদায়ের নারীরা পুরুষের অর্ধেক হলেও সম্পত্তিতে অধিকার পায়। কিন্তু হিন্দু ও বৌদ্ধ নারীরা একদম অসহায়, অধিকারহীনা! তাই হিন্দু উত্তরাধিকার আইন অবিলম্বে সংশোধন করা দরকার। লিঙ্গপরিচয় নির্বিশেষে সবাই মানুষ। সমান উত্তরাধিকার পাওয়া সকলের জন্মগত অধিকার।

পুলক ঘটক সাংবাদিক; সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ হিন্দু আইন সংস্কার পরিষদ। ghatack@gmail.com